শ্রীরামকৃষ্ণকে বোঝা

প্রব্রাজিকা সদাত্মপ্রাণা

[প্রয়াত লেখিকা দীর্ঘদিন নিবোধত পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদিকা ছিলেন। তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া এই অপ্রকাশিত রচনাটি পত্রিকার পাঠকবর্গের কাছে আদৃত হবে আশা করি।—সঃ]

শ্রীরামকৃষ্ণ অবাঙ্‌মনসোগোচর সচ্চিদানন্দের সগুণ সাকার প্রকাশ। তিনি স্বরূপত নির্গুণ হয়েও ভক্তের আর্তিতে গুণময়। তিনি বলতেন, দূর থেকে দেখলে সমুদ্রের রং নীল, কাছে গিয়ে জল হাতে নিয়ে দেখলে কোনও রং নেই। যত তাঁকে বোধে বোধ করতে যাওয়া, ততই উপমা-উচ্ছ্বাসের অপ্রতুলতায় মৌন হওয়া—এছাড়া উপায় নেই। সমুদ্রে নেমে নুনের পুতুলের সমুদ্র মাপার উদাহরণ তো তিনিই শুনিয়েছেন। উপনিষদও বলছেন—শুদ্ধোদকে শুদ্ধোদক মিলিত হলে তার আর পৃথক সত্তা থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণ নির্গুণ ও সগুণ, সাকার ও নিরাকার—দুই অবস্থার মধ্যে 'ভাবমুখে' অবস্থান করতেন; যে তাঁকে যত বুঝেছে, সে তত নাম-রূপের পারে অনন্ত ব্রহ্মসমুদ্রের আভাস পেয়েছে।

এমন 'দেবমানব'কে বোঝার জন্য আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সাধনা কই! তাছাড়া শ্রুতিমুখে শুনি, 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ'—চৈতন্যস্বরূপ বিজ্ঞাতা আত্মাকে জড় দেহেন্দ্রিয়মনবুদ্ধি দিয়ে কী করে জানবে? উপনিষদ আরও সাবধান করেছেন : 'অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্'—জ্ঞানী জানেন, ব্রহ্ম কখনও জ্ঞানের বিষয় হন না; অজ্ঞই বরং ভাবে—আমি তাঁর সবটুকু জেনে ফেলেছি!

তবু মানুষ নিজের জানার আগ্রহ থামাতে পারে না। মানুষের অন্তরে চৈতন্য বা আত্মারূপে যিনি আছেন, তাঁর আপন স্বরূপে ফিরে যাওয়ার ব্যাকুলতা স্বাভাবিক। 'হারিয়ে পাওয়া, পেয়ে হারানো'র লীলা তাই চিরকালীন।

আমাদের চিত্তেও একটা বিস্ময় এসে বারবার ঢেউ তোলে—ভক্তেরা যাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ নামে ইষ্টজ্ঞানে আশ্রয় করেছেন—তিনি কে? আমরা বলি, ঈশ্বরের অবতার তিনি। মানুষকে পরমার্থের সন্ধান দিতে মানুষের আকৃতি নিয়ে ধূলিধূসর ধরণীতে নেমে এসেছেন। স্বয়ং ঈশ্বর হয়েও সুখদুঃখ, হাসিকান্নার জগতে ধরা দিয়েছেন। উদ্দেশ্য একটাই—মানুষকে তার আপন স্বরূপ চেনানো, তার নিজ নিকেতনের সন্ধান দেওয়া। কিন্তু অবতার বলে তাঁকে আমরা পুজো করি, ভক্তি-সমীহ করি—অথচ বুঝতে পারি কি? তিনি স্বয়ং না বোঝালে 'হিরণ্ময় পাত্রে'র ওপরের আবরণ তো অপসৃত হওয়ার নয়! 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'—কেউ বলতে পারে না—কে তাঁকে বোধে বোধ করতে পারবে। তিনি যাকে কৃপা করে বোঝাবেন, সে-ই বুঝবে।

ভগবান ষড়ৈশ্বর্যময়। অণিমা-লঘিমাদি তাঁর ঈশ্বরীয় বিভূতি। শ্রীরামকৃষ্ণ নাম নিয়ে নররূপে এসে এবার সবচেয়ে আগে সেইসব অপ্রাকৃত শক্তিকে সংহত করলেন অর্থাৎ গুরুত্ব দিলেন না। চারহাত বা দশহাতে নানা প্রহরণ না ধারণ করেও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সুডৌল দুই বাহুর প্রেমবন্ধনে সমস্ত বিশ্বকে আবদ্ধ করলেন।

জন্মের আগে পিতা ক্ষুদিরামকে তিনি গদাধর বিষ্ণুরূপে দর্শন দিয়েছিলেন। দরিদ্র ক্ষুদিরাম ভেবে ব্যাকুল—সর্বলোকপালককে তিনি পালন করবেন কীভাবে! নিজের অক্ষমতার কথা জানালেন তাই। তা সত্ত্বেও প্রসন্ন দেবতা সেদিন সেই দীনের কুটিরে অবতরণের অঙ্গীকার করলেন।

মা চন্দ্রমণিও শিবমন্দিরে এসে দেবতার জ্যোতির্ময় সত্তাকে নিজদেহে প্রবেশ করতে দেখেছিলেন। পুত্রজন্মের আগে ও পরে নানা অলৌকিক অনুভূতি তাঁর দৈনন্দিন জীবনকে ভরিয়ে তুলেছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য! পুত্রস্নেহের এমনই মায়া যে, শিশু গদাইকে বাবা-মা ভগবদ্‌বুদ্ধির পরিবর্তে সন্তানবোধেই পালন করলেন—তাঁর অপার্থিব সত্তার কথা বড়ো একটা মনে রইল না। বরং স্বস্বরূপ মনে রেখে শ্রীরামকৃষ্ণই সদ্যোমৃতা বৃদ্ধা চন্দ্রমণির পা ধরে কেঁদে বলেছিলেন—মা তুমি কে গো, আমায় গর্ভে ধরেছ?

কামারপুকুরের আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে গদাইয়ের বালগোপালমূর্তিটিই বড়ো প্রিয়—তার অনন্তশক্তির খবরে তাদের কী কাজ! ব্যতিক্রম যে একেবারে ছিল না, তা নয়। জীবনে সেই প্রথম গ্রামের মহিলাদের সঙ্গে বিশালাক্ষীদর্শনে চলেছে গদাই। মেয়েদের সঙ্গে চলতে চলতে একমনে গাইছে দেবীর বন্দনা। কখন ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়েছে। মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে তার কোমল অঙ্গ। অন্য রমণীরা ত্রস্তব্যস্ত হলেও ধর্মদাস লাহার মেয়ে প্রসন্নময়ী ভয় পাননি। তাঁর বুঝতে দেরি হয়নি যে, শুদ্ধসত্ত্ব বালকের মন দেবীর চিন্তায় দেবীলোকে চলে গিয়েছে।

গদাই যে আর পাঁচটা ছেলের মতো নয়, একথা ভক্ত চিনু শাঁখারিও বুঝেছিল। তাই খোলা মাঠের মধ্যে একান্তে বসে নিজের হাতে শিশু গদাইকে জিলিপি খাওয়াতে খাওয়াতে চোখের জলে ভেসে বলেছিল—গদাই আমি বুড়ো হয়েছি, বেশিদিন বাঁচব না, তুমি এবারে যে কত লীলাখেলা করবে তা দেখতেও পাব না। সে যাই হোক, গদাই, আমার তায় ক্ষোভ নাই, আমায় কৃপা করো, আমার জন্ম সার্থক করো।

বস্তুত চেনা-অচেনা আলোছায়ার খেলাতেই অবতারজীবন এত মাধুর্যময়। তিনি নিজেই নিজের স্বরূপ সর্বদা মনে রাখেন না, নামরূপের আবরণে নিজেকে ঢেকে প্রাকৃতজনের মতো সুখদুঃখের ঘেরাটোপের মধ্যে দিব্যি মানিয়ে নেন। আবার কখনও সেই আবরণ সরে যায়—ভিতরের সচ্চিদানন্দ বাইরে এসে বলেন : আমি যুগে যুগে অবতার।

কামারপুকুর থেকে দাদা রামকুমারের সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন তরুণ গদাধর। যজন-যাজনের মাধ্যমে সাধ্যমতো উপার্জন করতেন রামকুমার। মনে আশা ছিল, উপার্জনের কাজে ছোটো ভাইয়ের সহযোগিতা পাবেন। কিন্তু শহরের রোশনাই ভালো লাগেনি গদাধরের। ভালো লাগেনি ভোগের পিছনে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলার দৃশ্য। নিজের মানসিক গঠন এবং চাহিদা জানতেন বলেই দাদাকে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, চালকলাবাঁধা বিদ্যাশিক্ষায় তাঁর মতি নেই। এমন বলিষ্ঠ দেহ, প্রাণপ্রাচুর্য, এমন স্মৃতিশক্তি, সর্বোপরি হৃদয়ে এত ভালোবাসা—এইসব মৌলিক মানবসম্পদ সহায়ে ঈশ্বরলাভের দুশ্চর তপস্যা কি তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না? আর জীবনের উদ্দেশ্যই যদি হয় ভগবানলাভ, তবে কেন তার গতি একমুখী হবে না?

এরপর ঘটনার আবর্তে গদাধর এসে পড়লেন শহর কলকাতার উপকণ্ঠে রানি রাসমণির সদ্যোনির্মিত দেবালয়ে। সেখানে প্রথমে মা কালীর বেশকাররূপে, পরে পূজারি হিসেবে তাঁর স্থান হল। সাধক গদাধর পাষাণপ্রতিমাকে চিন্ময়ী জগজ্জননীবোধে মনপ্রাণ দিয়ে সেবা করতে লাগলেন। শুধুমাত্র বৈরাগ্য আর ব্যাকুলতাকে অবলম্বন করে ঈশ্বরলাভ যে সম্ভব, তার অসামান্য নজির দেখে জগৎ স্তম্ভিত হল।

এরপর প্রাণের টানে জগন্মাতার আদরের দুলাল তাঁর চিদানন্দময়ী মাকে যেন নানাভাবে নানারূপে উপলব্ধি করার আর্তিতে একের পর এক ধর্মপথে ও মতে সাধনা করে চললেন। তিনি যে স্বয়ং ঈশ্বর একথা কে বুঝবে! কৌতূহলী কেউ প্রশ্ন করলে নিজের স্বরূপের ওপর আবরণ টেনে অমায়িক হেসে বলেন—আমি কিছু জানি না। আমার মা সব জানেন। মা ইচ্ছাময়ী, তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র।

সেই ইচ্ছাময়ী, ব্রহ্মময়ী কালীর খাসতালুকে বসে সাধনায় মগ্ন হয়ে গেলেন গদাধর। পুণ্যতোয়া গঙ্গার

তীরে সুন্দর দেবালয়, নির্জন নদীতট—গাছগাছালিতে ঢাকা। সেখানেই পঞ্চবটী নির্মিত হল। মায়ের ইচ্ছায় একে একে এলেন উচ্চকোটি সাধকের দল। এলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণী, রামাইত সাধু জটাধারী, এমনকী অদ্বৈতবাদী শ্রীমৎ তোতাপুরী। শুধু হিন্দু দেবদেবীর আরাধনাই নয়, মা কালীর নির্দেশে খ্রিস্টান, ইসলাম প্রভৃতি ভিন্নধর্মের স্বতন্ত্র সাধনাতেও তিনি সিদ্ধ হলেন।

সাধনার এই দীর্ঘ বারো বছরে তিনি কি বোঝেননি তাঁর স্বরূপ? কাদের মঙ্গলের জন্য 'যোলো টাং' করে দেখানোর এই কঠিন প্রয়াস? ধর্মে ধর্মে অসহিষ্ণুতা আজকের প্রগতিশীল সমাজজীবনে যখন হিংসার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয়, তখন সত্যিই মনে হয়, কত সুদূরপ্রসারী ছিল এই সমন্বয়ী অবতারের সাধনার তাৎপর্য! শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতাররূপে গ্রহণ করেও ব্যক্তিজীবনে কি আমরা উদার, সহিষ্ণু হতে পেরেছি!!

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার সবটাই ছিল অনুভূতিবেদ্য। ব্যাকুলতার প্রাবল্যে মন্দিরে যেদিন জগন্মাতার জ্যোতির্ময়ী সত্তাকে অনুভব করেছিলেন এবং স্বয়ং সেই জ্যোতির প্লাবনে ভেসে গিয়েছিলেন, সেদিন থেকেই তাঁর কাছে অমৃতলোকের দ্বার খুলে গিয়েছিল। সেখানে আমি-তুমি, ছোটো-বড়ো ভেদ নেই। সবই সেই অখণ্ড অনন্ত ব্রহ্ম।

পঞ্চবটী ও বেলতলায় সাধনকালেও তিনি দেখেছিলেন, যখন যেভাবে সাধন করছেন, সেই ভাবের আরাধ্য দেবতা সাকার জ্যোতির্ময় রূপ নিয়ে তাঁরই শরীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছেন। এত দেখাশোনার পর নিজের স্বরূপ বুঝতে কি তাঁর বাকি ছিল?

না। এতটা ভুল তাঁর হয়নি। জগদম্বা তাঁর বালককে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—মা ও ছেলে স্বরূপত এক। ''শক্তিরই অবতার। অবতার পর্যন্ত শক্তির অন্ডারে।'' গীতামুখেও তো ভগবান তাঁর মায়াশক্তির ক্ষমতা বুঝিয়েছেন—অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ /প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া—আমি জন্মহীন, অব্যয় ঈশ্বর হলেও নিজের মায়াশক্তি-সহায়ে সগুণ সাকাররূপে জন্ম নিই, অবতীর্ণ হই।

ঈশ্বরপ্রেমের তুফান যখন উঠেছিল তখন এই লোকোত্তর পুরুষকে চেনা সহজ ছিল না। সেই অবস্থায় গদাধর মা কালীর পূজা করতে বসে কখনও কখনও নিজেরই অর্চনা করতেন। 'প্রেমে হাসে কাঁদে নাচে গায়।' কখনও ভাবোন্মাদ, কখনও জড়বৎ স্থির। কালীবাড়ির কর্মচারীরা তাঁর হাবভাব দেখে ভাবত, ছোটো ভট্চাযের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

কিন্তু এই অবস্থাতেও তাঁকে চিনেছিলেন রানি রাসমণি। অন্তর্যামী গদাধর যে সকলের গোপন গভীর চিন্তা অনায়াসে বুঝতে পারেন, রানি স্বয়ং তার পরিচয় পেয়েছিলেন। রানির কুশলী জামাই মথুরবাবুও প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই এই সুদর্শন যুবকটিকে ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝলেন পবিত্রতা, সততা, চারিত্রিক দৃঢ়তায় গদাধরের স্থান কত উঁচুতে। শত প্রলোভনেও অনড় তাঁর চিত্ত। তবু তখনও বোঝার কিছু বাকি ছিল। সব সংশয় ঘুচে গেল গদাধরের শ্রীঅঙ্গে আপন ইষ্ট—শিব ও কালীকে যুগপৎ দর্শনে। মথুরের ভাগ্যলিপিতে নাকি ছিল—ইষ্ট তাঁর কল্যাণের জন্য সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে ফিরবেন। সেই দর্শনের পর থেকে দেবীভক্ত মথুর আমৃত্যু গদাধরকে নিজ ইষ্টের জীবন্ত বিগ্রহ জ্ঞান করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতাররূপে প্রথম ঘোষণার গৌরব কিন্তু এক নারীর। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের গুরুস্থানীয়া ভৈরবী ব্রাহ্মণী। ১৮৬১-র কোনও এক সময় ভৈরবী কালীবাড়িতে আসেন। ঠাকুরের দিব্যোন্মাদ অবস্থা যে শ্রীরাধিকা এবং শ্রীচৈতন্যদেবের মতো মহাভাবের সাত্ত্বিক প্রকাশ—একথা তিনি স্পষ্টই নির্দেশ করলেন। এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব—একথা নির্দ্বিধায় বললেন তিনি। বাংলায় প্রচলিত চৌষট্টিখানা প্রধান তন্ত্রকথিত সাধন একে একে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে সাধন করালেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, শ্রীরামকৃষ্ণ যে শ্রীচৈতন্যেরই মতো ঈশ্বরাবতার—একথা প্রমাণ করতে মথুরামোহনের সহায়তায় ব্রাহ্মণী সভা আহ্বান করালেন।

বৈষ্ণবসমাজে সুপণ্ডিত ও ভক্তরূপে সমাদৃত বৈষ্ণবচরণ সভায় এলেন। এলেন বাঁকুড়ার ইঁদেশ থেকে গৌরী পণ্ডিত। ব্রাহ্মণীর সিদ্ধান্তে সহমত জানিয়ে তাঁরাও বললেন, অপূর্ব এই সাধকচূড়ামণি ঈশ্বরাবতার স্বয়ং। ভাবে ও বিশ্বাসে ভরপুর হয়ে গৌরী পণ্ডিত

এমনও মন্তব্য করেন—বৈষ্ণবচরণ আপনাকে অবতার বলে? তবে তো ছোটো কথা বলে। আমার ধারণা, যাঁর অংশ থেকে যুগে যুগে অবতারেরা লোককল্যাণ-সাধনে জগতে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন,... আপনি তিনিই।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাচীনদের দীর্ঘসাধনসঞ্জাত এই অন্তর্দৃষ্টি এবং অনুভূতিকে যথেষ্ট মান দিতেন। তাই উত্তরকালে রাম দত্ত, গিরিশ ঘোষ, মনোমোহন মিত্র প্রমুখ গৃহী ভক্তেরা তাঁকে অবতার বলে খুব হাঁকডাক শুরু করলে সকৌতুকে তিনি বলেছিলেন, ''একসময় বামনী, বৈষ্ণবচরণ, ইঁদেশের গৌরী পণ্ডিত, বর্ধমান রাজার সভাপণ্ডিত পদ্মলোচন আমাকে অবতার বলেছিল। এখন গিরিশ, রাম, মনোমোহন আমাকে অবতার বলে।'' একথা বলার উদ্দেশ্য—যাঁদের সাধনা ও পাণ্ডিত্যের জোর ছিল তাঁরা সেই কবে তাঁকে ঈশ্বরাবতার বলে ঘোষণা করে গেছেন, এখন গিরিশ প্রমুখ ভক্তেরা নতুন করে আর কী বলবেন, এঁরা বলেন নিছক ভক্তিতে।

সে যা হোক, নিজেকে তিনি সত্যিই যখন বোঝাতে চেয়েছেন তখন গুরু তোতাপুরীর মতো কট্টর বেদান্তীও মর্মে মর্মে জেনেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণের এতটাই ক্ষমতা যে তাঁর ইচ্ছায় অসম্ভব সম্ভব হয়। তোতাপুরী ব্রহ্মের সমান গুরুত্ব দিয়ে তাঁর শক্তিকে, কালীকে মানতে বাধ্য হয়েছেন। যিনি স্বয়ং জগতের আশ্রয়, তাঁর লৌকিক গুরুকরণ শুধু প্রচলিত রীতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে নয়। গুরুরূপে আগত সাধকদের ধর্মজীবনে সম্পূর্ণতা বিধান, তাঁদের পরমার্থলাভের পথে প্রেরণাদানও অবতারের কল্যাণচিন্তার অঙ্গীভূত হয়েছে।

নিজেকে জানার সাধনা যখন পূর্ণ, তখন শুরু হল নিজেকে দেওয়ার সাধনা। ১৮৭০-এ অক্ষয়ের মৃত্যুর পর শ্রীরামকৃষ্ণ কুঠিবাড়িতে দীর্ঘ ষোলো বছর বাসের পর চলে এলেন অনতিদূরে কালীবাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণের ঘরখানিতে। এখান থেকে বেশ গঙ্গা দেখা যায়। দক্ষিণদিকের দরজা দিয়ে উঠোনে নেমে যাওয়া যায় ভবতারিণীর মন্দিরে, রাধাকান্ত এবং দ্বাদশ শিবের মন্দিরে। এই ঘরে তিনি ছিলেন প্রায় চোদ্দো বছর।

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলে স্বীকার করলেও কলকাতা বা আশেপাশের মানুষজনের মধ্যে সেকথা তেমন প্রচারিত হয়নি। হয়তো মথুরামোহন স্বয়ং সতর্ক থেকেছেন যাতে বিষয়ী লোকে ভিড় জমিয়ে তাঁকে উত্যক্ত না করে।

দেশবিদেশে খ্যাতিমান ব্রাহ্মনেতা কেশব সেন যখন 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংসের অপূর্ব দিব্যজীবনের কথা প্রকাশ করেন, তখন থেকেই কৌতূহলী, হুজুগে কলকাতার মানুষ তাঁর দর্শনের জন্য আসতে শুরু করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন এসব যোগাযোগ জগদম্বারই ইচ্ছায়। বুকে হাত রেখে কেশবকে নাকি বলেছিলেন—এখানকার ভাব যদি একবার প্রকাশিত হতে চায়, তবে শত হিমালয় পর্বত চাপা দিলেও তাকে ঢাকা যাবে না। কৃপা করবেন বলে এবার ছদ্মবেশে রাজার নগর পরিদর্শন। এবার কৃপাবাতাস এমন উথালপাথাল, যে-গাছে এতটুকু সার আছে, সে-গাছ চন্দন হবেই। মলয়ের হাওয়া কি না, কোনও বাছবিচার নেই। নিজেই রহস্য করে বলেছেন—বাউলের দল এল, নাচগান করলে, চলে গেল। কেউ তাদের চিনল না। ভক্তের কাছে নিজের সম্পর্কে বলছেন—ও যেন 'অচিনে গাছ, ' কে তাঁকে বুঝবে!

দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস কেমন তা জানতে চাইলে শ্রীম বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন—তিনি লালপেড়ে কাপড় পরেন, জামাজুতো পরেন, কালীবাড়ির একটি সাধারণ ঘরে থাকেন। অর্থাৎ বাহ্য কোনও চিহ্ন নেই। শুধু একটি বৈশিষ্ট্য : ''ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না। অহর্নিশ তাঁরই চিন্তা করেন।''

তাঁর ঘরের সব দরজাই সারাদিন খোলা—কত মানুষ যে আসত! ঘরে কত উচ্চ প্রসঙ্গ, নামগান, খোলকরতাল সহ কীর্তন আর ঠাকুরের মুহুর্মুহু সমাধি। আজও আমরা সেই উনিশ শতকের রেনেসাঁর পটভূমিকায় নবজাগ্রত বাংলার উজ্জ্বল চিত্রটি বোধহয় ধারণা করতে পারি না। অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু নন, সেসময় ধর্মজগতে বহু বিরল ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল। একদিকে কেশব সেনের মতো ব্রাহ্মনেতার ভাষণ, অন্যদিকে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো ব্রাহ্ম আচার্যের প্রভাব, সেইসঙ্গে পাড়ায় পাড়ায় হরিসভা, পালাকীর্তন, যাত্রা-কথকতা! শ্রীরামকৃষ্ণের

ঘরে ধর্মপ্রসঙ্গের যেসব টুকরো টুকরো ছবি কথামৃতে ধরা আছে, সেগুলি অনুধাবন করতে গিয়ে মনে হয়, তুলনায় আজকের কলকাতার সাধারণ মানুষ ধর্ম ও ধর্মজীবন সম্পর্কে অনেক উদাসীন। সে যা হোক, শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরখানিতে যাঁরা আসতেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন কৌতূহলী আগন্তুক। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই তাঁদের কালীবাড়ির 'বিল্ডিং টিল্ডিং' দেখতে উঠিয়ে দিতেন। আবার কেউ চাইতেন রোগশোক-নাশী মাদুলি বা 'দৈবী প্রতিবিধান'। ধর্মকে পার্থিব বাসনাপূরণের উপায়রূপে ব্যবহার—শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে খুবই হেয় ছিল। সিদ্ধাই, বিভূতি, অলৌকিক ক্ষমতা—এগুলিকে চিরদিনই তিনি ধর্মপথের অন্তরায় বলে উল্লেখ করেছেন। বলা বাহুল্য, এই দুই ধরনের মানুষের মনে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের স্বরূপ সম্পর্কে কোনও জিজ্ঞাসা ছিল না। অবশ্য অপব্যাখ্যা করতে কেউ ছাড়েনি। বিজ্ঞান মহারাজ দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করেন শুনে তাঁর দিদি বলেছিলেন, ''ওই পাগলা বামুনটার কাছে (গিয়েছিলি) বুঝি? ওরে তার কাছে যাসনি, যাসনি। সে লোকটা পাগল। আমি প্রায় ওই ঘাটে স্নান করতে যাই। তার সব দেখেছি, সব জানি।'' শ্রীরামকৃষ্ণকে বোঝার কী নমুনা!

এছাড়াও আসতেন কিছু গৃহস্থ এবং ইউনিভার্সিটির ছাত্র। তাঁদের মধ্যেও সকলের সংস্কার এক নয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা যেখানে আন্তরিক, ভগবান সেখানে কৃপাসুমুখ। নিজেই তো বলেছেন—জীব এক পা এগোলে তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন।

শেষোক্ত এই ঈশ্বরজিজ্ঞাসুদের পক্ষেও তাঁকে চেনা সহজ ছিল না। হাতে ধনুর্বাণ নেই, পাঞ্চজন্যের ঘোর আরাব নেই, শঙ্খচক্রগদাপদ্মের চিহ্নমাত্র নেই—মানুষ বই অবতার বললেই হল! মনে পড়ে যায় ঠাকুর স্বয়ং যে-গানের কলি তুরীয়ানন্দ মহারাজকে শুনিয়েছিলেন সেই অর্থবহ শব্দগুলি—ওরে কুশীলব করিস কী গৌরব, ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে?

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গজনের কাছে আপন স্বরূপ লুকিয়ে রাখতে চাইতেন না। এরাই যে আবিশ্ব মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে তাঁর উদার উন্নত দেশনা! কথার ফাঁকে ফস করে বলে বসতেন, ''আমাকে তোমার কী বলে মনে হয়?'' ''ক আনা জ্ঞান হয়েছে?''

শ্রীম পরবর্তী কালে মন্তব্য করেছেন : ''ঠাকুর বলছেন, 'আমি কে আর তোরা কে—এ জানতে পারলেই হল। আর কিছুর দরকার হবে না।' অর্থাৎ তিনি ঈশ্বর—অবতার হয়ে এসেছেন—এ জানলে, ভক্তরা তাঁর অংশ, পার্ষদ হবে—একথা জানতে পারলে তারা আর মায়ায় পড়বে না।''

তিনি যে সর্বদেবদেবীস্বরূপ—এ-সত্য অন্তরঙ্গদের কাছে গোপন ছিল না। পার্ষদদের মধ্যে কতজন তাঁকে কত রূপেই না দর্শন করেছেন! স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁর নিজের ধারণাকে অতি সংক্ষেপে বলেছিলেন, 'LOVE Personified,' কিন্তু সেসব গভীর অনুভূতির অনেক আগে—শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয় যখন দিনে দিনে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে—সেসময় কতদিন রাতে তাঁর অনুভব হয়েছে, তাঁর দেহটা বাড়িতে পড়ে থাকলেও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সূক্ষ্মশরীর আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়েছেন দক্ষিণেশ্বরে। সেই দিব্য প্রেমের প্রসঙ্গে অভিভূত হয়ে গেয়েছেন—'প্রেমধন বিলায় গোরা রায়।' গীত সাঙ্গ হলে বলেছেন, ''সত্য সত্যই বিলাচ্ছেন। প্রেম বল, ভক্তি বল, জ্ঞান বল, মুক্তি বল, গোরা রায় যাকে যা ইচ্ছা তাকে বিলাচ্ছেন।'' প্রেমের অদ্বিতীয় প্রতিমা শ্রীরাধার দর্শন পেয়েছিলেন স্বামীজী। শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁর জন্য রাধারূপ ধারণ করেছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ পুরীধামে জগন্নাথরূপে ঠাকুরের দর্শন পান। বালগোপালরূপে দর্শন দিয়ে গোপালের মার জীবনব্যাপী সাধনাকে তিনি পূর্ণতা দিয়েছিলেন। আর ধ্যানকালে অভেদানন্দের দর্শন হয়েছিল—সকল দেবদেবীর কেন্দ্রে জ্যোতির্ময় শ্রীরামকৃষ্ণ সিংহাসনে আসীন। ঠাকুর সেকথা শুনে বলেছিলেন, ''যা তোর বৈকুণ্ঠদর্শন হয়ে গেল। এখন তুই অরূপের ঘরে উঠলি। আর রূপ দেখতে পাবি না।''

এইসব অপার্থিব দর্শন শুধু সন্তানদের সঙ্গে সম্পর্ককে নিবিড়তর করার উদ্দেশ্যে। হাজরামশাই যুবকভক্তদের বলতেন—রামকৃষ্ণদেবের অনেক যোগৈশ্বর্য আছে। সময় থাকতে তোমরা তা চেয়ে নাও। সেকথা কানে যেতে ঠাকুর বিরক্ত হয়ে ছেলেদের বলেছিলেন, ওই কাঙালপনা তাদের জন্য নয়, তারা

কিনা রাজার ব্যাটা! বলেছিলেন, তাঁর সব ঐশ্বর্য তাঁর সন্তানদেরই জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যসান্নিধ্যে এসে তাঁর জন্মজন্মান্তরের আপনজন, অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মনে হত—ইনিই আমাদের 'গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।" ঈশ্বরকোটি বালকভক্ত পূর্ণ অসংশয়ে যেমন বলেছিলেন : ''আপনি ভগবান—সাক্ষাৎ ঈশ্বর।" কিন্তু চিনলেই তো সব হল না। সাধনসহায়ে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা পাকা করা চাই। তাই মানসপুত্র রাখালচন্দ্র থেকে শুরু করে ত্যাগী সন্তানদের সকলেই গভীর তপস্যা, ধ্যানধারণা করেছেন। যাঁকে তাঁরা দেখেছিলেন চোখের সামনে, তাঁরই স্বরূপকে এবং অনন্ত ভাবকে ধারণা করতে চেষ্টা করেছেন।

ভগবানকে চেনার তো শেষ নেই। প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে নরেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর আলাদা সম্পর্ক। নরেন্দ্র দিনে দিনে তাঁকে এতটা চিনেছিলেন যে, যুক্তি দিয়ে সংশয়ী ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকারকে শ্যামপুকুরে বোঝাচ্ছেন কেন ছেলেরা শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করে। বলছেন, ''ভেজিটেবল ক্রিয়েশন ও অ্যানিম্যাল ক্রিয়েশন—এদের মাঝামাঝি এমন একটা পয়েন্ট আছে যেখানে এটা উদ্ভিদ কি প্রাণী, স্থির করা ভারি কঠিন। সেইরূপ Man World ও God World—এই দুয়ের মধ্যে একটি স্থান আছে, যেখানে বলা কঠিন—এ ব্যক্তি মানুষ না ঈশ্বর।" এতটা বুঝেছেন তবু শ্রীরামকৃষ্ণের শেষসময় সামনে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্তের জন্য হলেও মনে হয়েছে—''এ অবস্থায় যদি স্বমুখে বলেন, আমি অবতার, তো বুঝি!" আর তখনই অন্তর্যামী ঠাকুর বলে উঠেছেন—''এখনও অবিশ্বাস! যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং এ-শরীরে রামকৃষ্ণ।" এরপর কত অভিজ্ঞতা—দেশেবিদেশে! নরেন্দ্র থেকে বিবেকানন্দে রূপান্তর! বয়স ও অভিজ্ঞতার পরিপক্কতা। স্বামীজীর কাছে গিরিশ ঘোষ একবার প্রস্তাব করেছিলেন—তিনি যেন ঠাকুরের একটা জীবনী লেখেন। পরম কুণ্ঠার সঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন, ''শেষে কি শিব গড়তে বাঁদর গড়ব!" তবু প্রাণের আর্তি ঢেলে নবগোপাল ঘোষের বাড়িতে ঠাকুরের প্রণামমন্ত্রে তাঁর বিশ্বাস প্রকাশ করলেন : স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।/ অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥ তারও আগে ঋষি বিবেকানন্দের কণ্ঠে শোনা গিয়েছিল নব পুরুষসূক্ত। বিরাটপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ বন্দনা—খণ্ডন-ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়।

স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে চিঠিতে লিখেছিলেন : শ্রীরামকৃষ্ণের মতো এত উন্নত চরিত্র কোনও কালে কোনও মহাপুরুষের হয়নি; সুতরাং তাঁকেই কেন্দ্র করে আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। অথচ প্রত্যেকের তাঁকে নিজের ভাবে গ্রহণ করার স্বাধীনতা থাকবে। কেউ আচার্য বলুক, কেউ পরিত্রাতা, কেউ ঈশ্বর, কেউ আদর্শ পুরুষ, কেউবা মহাপুরুষ—যার যা খুশি।

এইটিই শ্রীরামকৃষ্ণকে বোঝার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। তিনি অনন্ত ভাবময়। সেইসঙ্গে নামরূপাতীত, ভাবাতীত সত্তা। তাঁর ইয়ত্তা কে করবে! একথাটাই গিরিশ ভিন্ন ভাষায় বলেছিলেন : ''ব্যাস-বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেননি, আমি তাঁর সম্পর্কে অধিক কি বলতে পারি!"

শ্রীরামকৃষ্ণকে যে বুঝবে সে তাঁর ভাষায় 'এখানকার লোক'। তাঁর আপনজন। সে জানে শ্রীরামকৃষ্ণ সেই 'ফাঁক' যা দিয়ে অনন্তকে অনুভব করা যায়। তাঁকে বোঝা আমাদের কোনওদিন ফুরাবে না। সেই জানার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও চিনব আমরা। গানে যেমন আছে : ''যত পাছে পাছে ছুটে যাব আমি/তত আরও আরও দূরে রবে তুমি।/যতই না পাব তত পেতে চাব/ততই বাড়িবে পিপাসা আমার।/আদর্শ তোমারে দেখিব যত,/ তোমার স্বভাব পেয়ে হব তোমার মতো/ফুরাবে না তুমি ফুরাব না আমি, তোমাতে আমাতে হব একাকার।"

শ্রীরামকৃষ্ণকে বোঝার অর্থ—অনন্তকে গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হওয়া। সেখানে মতুয়ার বুদ্ধি নেই। ব্রাহ্মণ-শূদ্র, ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান ভেদ নেই। অনন্তকে বোধে বোধ করা যায়। ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণকে বোঝার সঙ্গে সঙ্গে, ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও তাঁর সত্তায় সত্তাবান হব। আমাদের আর অন্য পরিচয় থাকবে না—রামকৃষ্ণময় হওয়া ছাড়া।